Vol. 29 | No. 3 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আধুনিক ভাষাতত্ত্ব

Volume	29
Issue	3
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বিশ্বজিৎ ঘোষ
Published online	June 1, 1986
DOI	10.62328/sp.v29i3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i3.8
Pages	272-277
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

আধুনিক ভাষাতত্ত্ব॥ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ॥ প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ ; পৃষ্ঠা ২৪+৬২৩ ; মূল্য : এক শত পঁচাত্তর টাকা মাত্র ॥

বাংলাদেশে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের চর্চা শুরু হয়েছে মোটামুটিভাবে ষাটের দশকের সূচনালগ্ন থেকে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, কাজী দীন মুহম্মদ, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ ষাটের দশকেই ভাষাতত্ত্ব-চর্চার একটা সমৃদ্ধ সরণি নির্মাণ করেছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভাষাতত্ত্ব-চর্চার এই ধারা আরো সমৃদ্ধ হয়েছে কয়েকজন নতুন ভাষাবিজ্ঞানীর শ্রম-প্রযত্ন আর সাধনায়। এঁদের পরিশ্রমী-প্রয়াসে সাধারণ ভাষাতত্ত্বের আলোচনা যেমন একটা সংহত ও বিন্যস্ত রূপ পেয়েছে, তেমনি বিশ্লেষিত হয়েছে, বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে, বাংলা ভাষার নানামাত্রিক প্রসঙ্গ। ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার এই সরণীতে সম্প্রতি সংযুক্ত হয়েছে প্রফেসর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ বিরচিত 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব'।

বাংলাদেশে সাধারণ ভাষাতত্ত্ব (*General Linguistics*) বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হলেও সেগুলো বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও বিন্যাস-রীতিতে মোটেই স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে না। অধিকাংশ গ্রন্থই বিদেশী বইয়ের সরাসরি ব্যর্থ অনুবাদ, বিশ্লেষণ-বিন্যাসে শৃঙ্খলাবিহীন। উদাহরণ সংগ্রহে বাংলা ভাষার প্রতি বৈমাত্রেয়-সুলভ আচরণ, সূত্র আর তত্ত্ব-বিশ্লেষণে অসম্পূর্ণতা এবং অস্বচ্ছতাই এসব গ্রন্থের মূল বৈশিষ্ট্য। এই পটভূমিতে আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' গ্রন্থটি সবিশেষ স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার। সাধারণ ভাষাতত্ত্বের এরকম পরিপূর্ণ ও পুংখানুপুংখ ভাষাতাত্ত্বিক বর্ণনায় উভয় বাংলার মধ্যে 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' একটি তাৎপর্যপূর্ণ, পরিশ্রমী এবং মেধাবী সৃষ্টি।

ভাষাবিজ্ঞানী আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের তত্ত্বগত দৃষ্টিকোণটি পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল এবং সূক্ষ্ম; নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে তিনি বাংলা ভাষা থেকে যে পরিমাণ দৃষ্টান্ত আহরণ করেছেন, তা গ্রন্থটির মৌল চারিত্র-নির্দেশক।

ডক্টর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের আলোচ্য গ্রন্থটি রচিত হয়েছে আমেরিকান ভাষাতাত্ত্বিকদের রীতি-পদ্ধতি অনুসারে। তিনি ঐতিহাসিক, তুলনামূলক, গঠনমূলক ও রূপান্তরমূলক পদ্ধতির সাহায্যে বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। তবে সকল আলোচনা-বিশ্লেষণে তাঁর কেন্দ্রীয় দৃষ্টিটি মূলত নিবদ্ধ ছিল পণ্ডিতসমাজের প্রজ্ঞার দিকে নয়; বরং সাধারণ পাঠক এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে। 'প্রসঙ্গ-কথা'য় লেখক বলছেন এই কথা, "ভাষাতত্ত্বের কয়েকটা প্রধান দিক সম্পর্কে সাধারণ পাঠক ও ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমান গ্রন্থ লিখিত। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠোপযোগী একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির পরই গ্রন্থ-রচনার কাজে অগ্রসর হই। ভাষাতত্ত্বের মত দুরূহ বিষয় সহজভাবে ব্যাখ্যা করা সব সময় সহজসাধ্য নয়। একথা মনে রেখে নিজের সাধ্যমত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয়তার দিক স্মরণ করে ঐতিহাসিক, তুলনামূলক, গঠনমূলক ও রূপান্তরমূলক পদ্ধতির সাহায্যে মূল বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে।"[১]

সর্বমোট দশটি অধ্যায় মিলে সৃষ্টি হয়েছে ছয় শতাধিক পৃষ্ঠার 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' গ্রন্থের অবয়ব। গ্রন্থভুক্ত অধ্যায়গুলো হচ্ছে-- ভূমিকা, ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, ভাষার শ্রেণীবিন্যাস, উপভাষাতত্ত্ব, লিখনরীতি, ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপমূল-তত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব এবং বাগর্থতত্ত্ব। অধ্যায়গুলোর নামকরণ দেখেই সাধারণ ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় গ্রন্থকারের অন্বিষ্ট ও অভীপ্সা উপলব্ধি করা যায়। 'ভূমিকা' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ভাষা, ভাষাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখা ও পদ্ধতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ। ভাষা-বিষয়ক আলোচনায় গ্রন্থকার স্পষ্টতই বলেছেন যে, ভাষার সমগ্র রূপ পর্যায়ক্রমিকভাবে একাধিক স্তরে বিভিন্ন নিয়ম ও শৃঙ্খলার অধীন। কোন একটি বিশেষ নিয়ম-সূত্রের সাহায্যে ভাষা-বিশ্লেষণ ও

তার গঠনপ্রণালী ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। লেখকের মতে 'যোগাযোগের সূত্র অনুযায়ী ভাষা হচ্ছে এক শ্রেণীর প্রক্রিয়া এবং মানুষের বাকভঙ্গী হচ্ছে প্রতীক।' ভাষাতত্ত্ব ও বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনাংশ এ-অধ্যায়ের একটা তাৎপর্যপূর্ণ এলাকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব। ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতি হচ্ছে ভাষা-বিশ্লেষণের সর্বপ্রাচীন পদ্ধতি। এই পদ্ধতির বিশ্লেষণে লেখক একটি জটিল বিষয়কে প্রাঞ্জলতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। এ-অধ্যায়ে লেখক গ্রীম, গ্রাসম্যান ও ভার্নারের ধ্বনিসূত্র সুশৃঙ্খলভাবে ও পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন, যা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে একটি অতি প্রয়োজনীয় এলাকা বলে বিবেচিত হবে। বিশ্লেষণের প্রাঞ্জলতা এবং তথ্যের সুশৃঙ্খলায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বিশ্লেষণ আলোচ্য অধ্যায়ের একটা তাৎপর্যপূর্ণ এলাকা। তবে ইন্দো-ইরানীয় ভাষাসমূহের বিভিন্ন স্তরের সময়কাল নির্দেশে পূর্বে লিখিত অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় 'ভাষার শ্রেণীবিন্যাস'। এ-অধ্যায়ে ভাষার বংশগত এবং রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীবিন্যাস আলোচিত হয়েছে। হেম্যান স্টাইনথল (১৮২৩--১৮৯৯), ম্যাক্স মূলার (১৮২৩--১৯০০), ফ্রান্জ মিসতেলি, এফ. এন. ফিংক (১৮৬৭-১৯১০), এডওয়ার্ড সাপির (১৮৮৪-১৯৩৯) জোসেফ এইচ. গ্রীনবার্গ (১৯১৫--) প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীর ভাষা শ্রেণীবিন্যাসরীতি লেখক দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক শ্রেণীবিন্যাস এবং শব্দ পরিসংখ্যানতত্ত্বীয় শ্রেণীবিন্যাসও এ-অধ্যায়ের দুটো উল্লেখযোগ্য উপ-অধ্যায়। ভাষার রূপমূলগত শ্রেণী-বিন্যাসে লেখক সচেতনভাবে অনুসরণ করেছেন অধ্যাপক তারাপোরে-ওয়ালাকে।

'উপ-ভাষাতত্ত্ব' শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায় আলোচ্য-গ্রন্থের একটা সমৃদ্ধ এলাকা। বাংলা ভাষাকে সামনে রেখে লেখক এখানে স্বচ্ছভাবে উপ-ভাষা সম্পর্কে একটা ধারণা উপস্থিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে ভৌগোলিক অবস্থান,

যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, অর্থনৈতিক ব্যবধান, সামাজিক ও ধর্মীয় শ্রেণীবিন্যাসের বৈষম্যের জন্যে প্রাচীনকালে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষার প্রচলন হয়। ব্রিটিশ যুগের পূর্বে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবহেতু ভৌগোলিক দূরত্বের জন্যে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক একটা ভাষার উপভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে। পরবর্তীকালে বাংলা চলিত ভাষার একটা রূপ কলকাতাকে কেন্দ্র করে গঠিত হলেও উপ-ভাষাগুলি পাশাপাশি ব্যবহৃত হতে থাকে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে আঞ্চলিক ভাষা গড়ে ওঠে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী; উত্তর-পূর্বে রংপুর ও সিলেট; পশ্চিমে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া; পূর্বাঞ্চলে ঢাকা ও ময়মনসিংহের উপ-ভাষা।"[২]

'লিখনরীতি' শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বাংলাদেশে রচিত অন্য কোন ভাষাতত্ত্ব-গ্রন্থে ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়নি। সেক্ষেত্রে লেখক অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। তিনি আদিম চিত্রাঙ্কন, স্মৃতিসংক্রান্ত নকশা চিহ্নিতকরণ, সুমেরীয় লিখনরীতি, মিশরীয় লিখনরীতি, হিত্তীয় লিখনরীতি, চীনা লিখনরীতি, প্রোটো-ভারতীয় লিখনরীতি ইত্যাদি যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস। ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেমন উন্নত ছিল, তেমনি ভাষাতত্ত্ব-চর্চার ক্ষেত্রেও। এই প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি; "ভাষাচর্চার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় ভারতে। প্রাচীনকালে আর্যদের ধর্মগ্রন্থে সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন লক্ষণীয়। এই সময়কার স্তোত্রগুলো বৈদিক সংস্কৃতে রচিত। পরবর্তীকালের ধ্রুপদী সংস্কৃতের সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতের গঠনগত পার্থক্য বিদ্যমান। স্তোত্রগুলো আটশ খ্রীস্টপূর্ব শতকের আগে লিপিবদ্ধ হয়নি। অনেকেই মনে করেন প্রাচীন স্তোত্রগুলো এর অনেক আগে রচিত। বৈদিক ও পরবর্তীকালের সংস্কৃত অধিগত করার ক্ষমতা কম পাওয়ায় সংস্কৃতের প্রকৃত উচ্চারণভঙ্গী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ...ভারতে ভাষাচর্চায় যাঁরা খ্যাতিমান, তাঁরা হলেন যাস্ক (খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতক), পাণিনী (খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতক), কাত্যায়ন (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) ও পাতঞ্জলি (খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক)। এঁদের মধ্যে

পাণিনী অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ রচনার মাধ্যমে ভাষাচর্চার বিশেষ একটা আদর্শ উপস্থাপিত করেন।"[৩] ভারতীয় ভাষাচর্চার ইতিহাস আলোচনার পর লেখক গ্রীসীয়, সফিস্টীয় প্রভৃতি এলাকার ভাষাতত্ত্ব–চর্চার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়টি লেখকের অধ্যয়নের বিস্তৃতিতে, অভিনিবেশের প্রগাঢ়তায় এবং বিন্যাসের ধারা-পরম্পরায় আলোচ্য গ্রন্থের একটি তাৎপর্যপূর্ণ এলাকা।

সপ্তম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ধ্বনিতত্ত্ব। এখানে লেখক বাক্-প্রত্যঙ্গ, স্বরধ্বনি, অর্ধ-স্বরধ্বনি, দ্বিস্বরধ্বনি, সানুনাসিক স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জন-ধ্বনি, সংযুক্ত ব্যঞ্জন, সংযোগস্থল, শ্বাসাঘাত, স্বরতরঙ্গ স্বরধ্বনিগত পরিবর্তন, ব্যঞ্জনধ্বনিগত পরিবর্তন, মূলধ্বনিতত্ত্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। শব্দবিজ্ঞান ধ্বনিতত্ত্ব আলোচ্য অধ্যায়ের একটা তাৎপর্যপূর্ণ এলাকা। অষ্টম অধ্যায়ে রূপমূলতত্ত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে। লেখক রূপমূল আলোচনায় গঠনমূলক এবং রূপান্তরমূলক উভয় ধারাই অনুসরণ করেছেন। অধ্যায়ের প্রথম অংশে তিনি গঠনমূলক এবং দ্বিতীয়াংশে রূপান্তরমূলক পদ্ধতির সাহায্যে রূপমূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের নাম 'বাক্যতত্ত্ব'। এ-অধ্যায়ের প্রথমে আলোচিত হয়েছে প্রথাগত ব্যাকরণ। অতঃপর বর্ণনামূলক বাক্যতত্ত্বের অব্যবহিত উপাদান এবং রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনা, ভাষার প্রাঞ্জলতায়, দুরূহ বিষয় সত্ত্বেও, আকর্ষণ করে নেয় সচেতন পাঠকের সংবেদনা। চমস্কির রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ লেখক যথেষ্ট পরিচ্ছন্নভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলা ভাষার আলোকে তত্ত্ব-রাজি বিশ্লেষণ করায় রূপান্তর ব্যাকরণের অনেক দুরূহ তত্ত্বও পাঠকের কাছে সহজবোধ্য হবে। গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ের নাম 'বাগর্থতত্ত্ব'। এ-অধ্যায়ে অর্থের আনুভূতিক উপাদান, ভাষা ব্যবহারের আপেক্ষিক ভিন্নতা, বর্ণনাত্মক বাগর্থতত্ত্ব, উৎপাদক অর্থতত্ত্ব, যোজতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এ-অধ্যায়টি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' গ্রন্থটি বাংলাদেশে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব-অনুশীলনে একটা উল্লেখযোগ্য এবং

তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়াস। ভাষার প্রাঞ্জলতায়, তত্ত্ব-বিশ্লেষণের সাবলীলতায়, বিষয়ের বিন্যাসে 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' লেখকের মেধা-শ্রম-প্রযত্ন আর গভীরতর অভিনিবেশের স্বাক্ষরবাহী।

তথ্যসঙ্কেত

১ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ: আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য---প্রসঙ্গ-কথা, পৃ. ৭

২ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ: পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

৩ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ: পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫-২৬।

বিশ্বজিৎ ঘোষ